Vol. 22 | No. 1 | 1978

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

উপভাষাতত্ত্ব ও বাংলাদেশের উপভাষা বিশ্লেষণ

Volume	22
Issue	1
Year	1978
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	রফিকুল ইসলাম
Published online	December 1, 1978
DOI	10.62328/sp.v22i1.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v22i1.5
Pages	83-96
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

উপভাষাতত্ত্ব ও বাংলাদেশের উপভাষা বিশ্লেষণ

রফিকুল ইসলাম

ভাষা ও উপভাষার সীমারেখা সর্বদা স্পষ্ট নয়, যেমন নয় উপভাষা থেকে উপ-ভাষার পার্থক্য। উপভাষা প্রধানতঃ ভাষার আঞ্চলিক বৈচিত্র্য বা রূপভেদ কিন্তু সামাজিক উপভাষার অস্তিত্বও গুরুত্বপূর্ণ। এক সময়ে ধারণা করা হত শিষ্ট বা ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভাষাই বিশুদ্ধ আর আঞ্চলিক ভাষা বিকৃত বা অশুদ্ধ কিন্তু সে ধারণার অবসান হয়েছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে কোন ভাষার শিষ্ট বা ষ্ট্যাণ্ডার্ড রূপ একটি সামাজিক উপভাষা বৈ নয়। সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কারণে কোন ভাষার একটি বিশেষ রূপ বিশেষ মর্যাদা পেয়ে থাকে, এবং সেটি শিষ্ট রূপে গৃহীত হয়। প্রায়শঃ ভাষার এই আধুনিক শিষ্ট রূপটি কৃত্রিম বা মিশ্রিত হয়ে থাকে : তুলনামূলকভাবে ভাষার আঞ্চলিক বা গ্রাম্য বা লোকরূপের মধ্যেই ভাষার প্রাচীন রূপ কিছুটা অবিকৃত থাকে। অর্থাৎ ভাষার পরিবর্তন শিষ্টরূপ অপেক্ষা আঞ্চলিকরূপে কম ঘটে থাকে। ভাষার ইতিহাস পুনর্গঠনে আঞ্চলিক রূপ বা উপভাষার বিশ্লেষণ ঐ জন্য প্রয়োজন হতে পারে।

ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পণ্ডিতদের ধারণা ছিল, অনুন্নত জাতি বা সম্প্রদায়ের বিশেষতঃ আদিবাসীদের ভাষা তাদের জীবনযাত্রার মানের মতোই অনুন্নত। কিন্তু আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান এবং অস্ট্রেলিয়া ও নিউগিনির আদিবাসীদের ভাষা বিশ্লেষণ থেকে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে, ঐ সব অনুন্নত আদিবাসীদের ভাষা অন্যান্য উন্নত জাতির ভাষার মতোই পরিপূর্ণরূপে বিকশিত। আজকের পৃথিবীতে যে সব মানবগোষ্ঠী একান্তই আদিম রয়ে গিয়েছে, যাদের জীবনযাত্রায় ব্যবহৃত উপাদান কাঠ, হাড় বা পাথরের টুকরোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং যারা পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করছে, তাদের ভাষাও উন্নত ও সুসভ্য মানুষের ভাষার মতোই মানব মনের ভাবের আদান-প্রদানে সক্ষম। আবার শহরের আধুনিক ভাষার তুলনায় গ্রামের আঞ্চলিক ভাষা মোটেও পশ্চাৎপদ নয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে উপভাষা সম্পর্কিত ধারণা খুব স্বচ্ছ ছিল না। তখন পর্যন্ত আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা বা গ্রাম্যভাষাকে শিষ্ট বা সাধু ভাষার বিকৃত ও ভ্রান্তরূপ বলে বিবেচনা করা হত। ১৮৭৫ থেকে ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন ভাষার ইতিহাস বা উদ্ভব ও বিবর্তন স্থির করতে গিয়ে বিভিন্ন ভাষা ও উপভাষার সংগঠন-বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ তথ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বিভিন্ন ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা শিষ্ট ভাষা বিশেষ ঐতিহাসিক বা সামাজিক কারণে কোন না কোন উপভাষা থেকেই উদ্ভূত এবং উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা শিষ্ট বা সাধু ভাষার বিকৃত রূপ নয়। উপভাষা-তত্ত্বে অগ্রণী ফরাসীরা ; আঞ্চলিক ভাষাতত্ত্বে ইতালিয়ানদের অবদানও গুরুত্বপূর্ণ। তবে প্রথম উপভাষা-মানচিত্র প্রণয়ন করেন জার্মান ভাষাতত্ত্ববিদ জর্জ ওয়েংকার (স্প্রাখ্-আতলাস্ দ্য দুসেন রাইখস্ ১৮৭৬ খ্রী.), তিনি তাঁর উপভাষা-প্রশ্নমালার উত্তর ভাষাতত্ত্ব-প্রশিক্ষণহীন গ্রাম্য স্কুল-শিক্ষকদের সহায়তায় সংগ্রহ করেছিলেন। ভাষাতাত্ত্বিক ভূগোল শাস্ত্রের উদ্ভাবক ফরাসী পণ্ডিত জুল গিলিয়েগঁ, তিনি ফরাসী উপভাষা জরীপে দুই হাজার

প্রশ্নসম্বলিত একটি প্রশ্নমালা ব্যবহার করেন। এই প্রশ্নমালার উত্তর সংগ্রহে তিনি ই. এডমণ্ট নামে একজন দক্ষ কর্মীকে নিযুক্ত করেছিলেন, যিনি ফরাসী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে ঐ প্রশ্নমালার উত্তর সংগ্রহ করেন। ফলে ফরাসী উপভাষা মানচিত্র জার্মান মানচিত্র থেকে নির্ভরযোগ্য হতে পেরেছিল। ফরাসী 'লা তলাস্ লিঙ্গুইস্তিক দ্য ফ্রাঁস ১৮৯৭ থেকে ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সংগৃহীত উপাদানের ভিত্তিতে ১৯০২-১২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত। সমসাময়িক কালে ভারতীয় উপমহাদেশে জর্জ গ্রীয়ার্সন ভাষা জরীপ করেন। তিনি একটি প্রচলিত লোককাহিনী বা গল্পের সাধুভাষায় লিখিতরূপ বিভিন্ন অঞ্চলে স্কুল শিক্ষকদের কাছে প্রেরণ করেন, তারা নিজ নিজ অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় গল্পটি রূপান্তরিত করে ফেরত পাঠান। এভাবে গ্রীয়ার্সন বিভিন্নভাষা ও উপভাষার নমুনা সংগ্রহ করে তাঁর বিশ্লেষণ কয়েক খণ্ডে 'লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে ১৯০৩ থেকে ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষার উপভাষা পরিচয় ঐ সার্ভের ৫ম খণ্ডের ১ম ভাগে প্রকাশিত হয়। ইতালির ভাষাতাত্ত্বিক ভূগোল 'স্প্রাখউণ্ড সাখাত্লাস্ উণ্ড স্যুদস্উইজ' প্রকাশিত হয় ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে, প্রণেতা কে. জেবার্গ এবং কে. জুড।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে উপভাষাতত্ত্ব মূলতঃ শব্দের বিশ্লেষণে কেন্দ্রীভূত ছিল। মুখের ভাষায় প্রচলিত শব্দের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণে উপভাষাতাত্ত্বিকেরা শব্দার্থ, বিকিরণ এবং বাক্যে তাঁদের ভূমিকা অনুযায়ী শব্দের ইতিহাস পুনর্গঠনের চেষ্টা করেছেন। ভৌগোলিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক জ্ঞানের সহায়তায় শব্দের ইতিহাস ব্যাখ্যার এক ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছিল. এ ছাড়াও শব্দের ইতিহাস অনুসন্ধানে জাতীয় মানস এবং পুরাতন ও নতুন ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণাদি সতর্কভাবে পরীক্ষা করা হত। উপভাষা বিশ্লেষণে একটি ভাষা উদ্ভব ও বিকাশে যেসব উপাদানের সংস্পর্শে আসে সেগুলো সম্পর্কে জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকৃত হয়। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শেষ ও প্রথম দিকে ভাষাতাত্ত্বিক ভূগোলের তত্ত্বগত ধারণা ছিল নিম্নরূপ :

ক. একটি ভাষার উপভাষাগত পার্থক্য প্রধানতঃ শব্দ ও ধ্বনি সংগঠনে পাওয়া যায়, তুলনামূলকভাবে রূপ ও বাক্ বা ব্যাকরণে পার্থক্য কম।

খ. সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণ ভাষাতাত্ত্বিক পার্থক্যের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় উপভাষার সংখ্যা বেশী কারণ বিভিন্ন সামন্তের অধীনে বিভিন্ন অঞ্চলের বিচ্ছিন্নতা ; অপর দিকে কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শাসনে বিভিন্ন অঞ্চলের বিচ্ছিন্নতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ফলে উপভাষার সংখ্যাও কমে যায়।

গ. ভাষাতাত্ত্বিক পার্থক্যের জন্যে ভৌগোলিক অবস্থা গুরুত্বপূর্ণ। সমতলভূমির তুলনায় পার্বত্য ভূমিতে ভাষাতাত্ত্বিক প্রান্তিক অঞ্চল বেশী। সহজ যোগাযোগের জন্যে একটি ভাষাতাত্ত্বিক উদ্ভব, আগম বা পরিবর্তন সহজেই সমতলভূমিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে অন্যদিকে একটি পার্বত্য অঞ্চলের ভাষা ভৌগোলিক কারণে সমতলভূমিতে পরিব্যাপ্ত মূলভাষার বিকাশ ও বিবর্তন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে।

ঘ. উপভাষা বিলোপ বা অবক্ষয়ের গতি সাম্প্রতিককালে দ্রুততর হয়েছে, কারণ গ্রামের মানুষ শহরের মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতি অনুকরণ ও গ্রহণের চেষ্টা করছে।[১]

১ Milka Ivich, 'Linguistic Geography,' *Trends in Linguistics*, The Hague, Mouton, 1970

ফরাসী উপভাষাবিদ্ গিলিয়েগঁ শব্দের উদ্ভব বা আগমের দুইটি কারণ নির্দেশ করেছেন, একই ধ্বনিবিশিষ্ট ভিন্নার্থক শব্দের সংঘাত এবং শব্দ সংগঠনের অনুপযোগিতা। সমধ্বন্যাত্মক শব্দের ভিন্ন পরিবেশের জন্যে নির্দিষ্ট ভিন্ন অর্থ যখন একই পরিবেশে ব্যবহৃত হতে থাকে তখন নির্দিষ্ট তাৎপর্য ব্যাহত হয় এবং একটি নতুন শব্দ ঐ দুইটি ভিন্ন অর্থের একটিকে গ্রহণ করে ফলে অভিন্ন ধ্বনিবিশিষ্ট ভিন্নার্থক পরিবেশের অবসান ঘটে। যেমন, ফরাসী গাস্কন উপভাষার 'গাত' শব্দটির দুটি অর্থ ছিল বিড়াল ও মোরগ। অনেক বাক্যে এটা বোঝা যেত না যে কথক কি বলছেন, কুকুরটা কি বেড়াল ধরেছে না মোরগ? ফলে 'গাত' শব্দটি এক সময় থেকে কেবল মোরগ অর্থেই ব্যবহৃত হতে থাকে, মোরগের জন্যে অন্য শব্দের উদ্ভব হয়। সময়ের বিবর্তনে একটি শব্দের ধ্বনি সংগঠন বদলে যেতে পারে, অনেক সময় দেখা গেছে যে একটি শব্দ হয়তো শুরুতে ব্যবহার উপযোগী ছিল কিন্তু ক্রমে ক্রমে শব্দটি অতি হ্রস্ব বা দীর্ঘ হয়ে পড়ার ফলে বা নতুন কোন ধ্বনি উপাদান সংযোজিত হওয়ার ফলে ভিন্ন অনুষঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে। এমতাবস্থায় একটি নতুন উপযোগী শব্দের উদ্ভাবন স্বাভাবিক, এভাবেই সমধ্বনি বিশিষ্ট ভিন্নার্থক শব্দে এবং অনুপযোগী শব্দ সংগঠনের কারণে নতুন শব্দের সৃষ্টি হতে পারে। উপভাষা নির্ণয়ে ফরাসীরা শব্দের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন যেমন দিয়েছিলেন জার্মানরা।

ইতালীর নব-ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা উপভাষাতত্ত্বে মূল্যবান অবদান রেখেছেন, তাঁদের তত্ত্বের ভিত্তি ছিল জার্মান ও ফরাসী ভাষাতাত্ত্বিক ভূগোলতত্ত্ব। নব-ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে একটি ভাষার মধ্যে অশুদ্ধ বলে কিছু নেই, যা টিকে থাকে সবই শুদ্ধ। তাঁদের মতে একটি ভাষার বিবর্তন প্রধানতঃ ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক পটভূমি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সুতরাং তারা উপভাষা বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ করেছেন। তারা সম্পর্কিত উপভাষা সমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনায় গুরুত্ব দিয়েছেন। যেসব ভৌগোলিক কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে একটি ভাষার উপভাষা বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় তার প্রতি তারা খুবই মনযোগ দেন। এভাবেই 'এরিয়েল লিঙ্গুইস্টিক্স' বা আঞ্চলিক ভাষাতত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। তারা ভাষার আঞ্চলিক বৈচিত্র্য নিরূপণের জন্যে 'সেন্ট্রাল' এবং 'পেরিফেরাল' বা কেন্দ্র ও প্রান্ত অঞ্চলের যে পার্থক্য নির্দেশ করেন উপভাষার সীমানা নির্দেশের জন্যে সে ধারণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কোন ভাষা-অঞ্চলের যেখানে একটি ভাষাতাত্ত্বিক আগম বা উদ্ভব ঘটে সেটি কেন্দ্র অঞ্চল, একটি ভাষা-অঞ্চলে সমগ্র ভাষাতাত্ত্বিক উপাদানের প্রেক্ষিতে অবশ্য কোন কেন্দ্র অঞ্চল নেই। ভাষাতাত্ত্বিক প্রান্ত অঞ্চলে (ভৌগোলিক অর্থে) সাধারণতঃ কিছু প্রাচীন বা অপ্রচলিত রূপ রক্ষিত থাকে কিন্তু প্রান্ত অঞ্চলে প্রাপ্ত সমস্ত ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যই প্রাচীন বা অপ্রচলিত রূপ নয়। তবে যদি দুইটি ভিন্ন প্রান্ত অঞ্চলে অভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক রূপ পাওয়া যায় তাহলে তা অপ্রচলিত বা প্রাচীন রূপ হয়ে থাকে। উপভাষাতত্ত্বের উপরোক্ত ধারণা ইতালিয়ানদের অবদান।[২]

জার্মান, ফরাসী ও ইতালিয়ান উপভাষাবিদ্‌রা ভাষার আঞ্চলিক বৈচিত্র্য সৃষ্টিকারী বৈশিষ্ট্যসমূহকে উপভাষা মানচিত্রে দৃশ্যমান করে তোলার পদ্ধতিরও উদ্ভাবক। একটি উপভাষা মানচিত্রে একটি বিশেষ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের অবস্থান এবং সীমা সমশব্দরেখা বা 'আইসোগ্লস' এর সাহায্যে নির্দেশ করা হয়। একটি ভাষার আঞ্চলিক বৈচিত্র্যসমূহ যে সব সমশব্দ রেখার সাহায্যে বিবৃত করা হয় সেগুলো সমশব্দ রেখাগুচ্ছ। কোন ভাষারই আঞ্চলিক বৈচিত্র্যসমূহ একপ্রকার নয়, তবে উপভাষা-মানচিত্রে যেসব অংশে সমশব্দরেখা কম সে সব অঞ্চলকেই ঐ ভাষার বিভিন্ন উপভাষার কেন্দ্র অঞ্চল বা 'ফোকাল এরিয়াজ' বলা হয়। নতুন উদ্ভব বা আগম একটি কেন্দ্র অঞ্চল থেকে উদ্ভূত হয়ে সম্প্রসারিত হয় এবং তা ঐ

২ *Ibid*

কেন্দ্র অঞ্চলের প্রভাবিত পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গৃহীত হয়। একটি উপভাষা অঞ্চলের প্রান্ত বা সীমান্ত অঞ্চলসমূহ উপভাষা বৈশিষ্ট্যের সন্ধি অঞ্চল বা 'ট্রানজিশান এরিয়াজ্', আর সম-শব্দরেখা অঞ্চল বহির্ভূত এলাকা সম্প্রসারিত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে দূরবর্তী অঞ্চল বা 'রেলিক এরিয়াজ্'। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ভৌগোলিক কারণে দূরবর্তী অঞ্চলের সৃষ্টি হতে পারে।[৩]

ইতালীয় নব-ভাষাতাত্ত্বিকেরাই ভাষার 'সাবস্ট্রেটাম' বা 'উপস্তর' তত্ত্বের উদ্ভাবক। এই তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য, যদি কোন জনগোষ্ঠী তার মাতৃভাষা পরিত্যাগ করে অপর কোন ভাষা গ্রহণ করে তাহলে পরবর্তী ভাষাটি পূর্ববর্তী ভাষার প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং এক্ষেত্রে এইটে ভাষাতাত্ত্বিক উপস্তরের প্রতিনিধিত্ব করে।[৪] উদাহরণ স্বরূপ বাংলাদেশের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, বাংলাদেশে উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে আর্যভাষা বিস্তারের পূর্বে অস্ট্রিকভাষা গোষ্ঠীর মুণ্ডা এবং অন্যান্য অনার্যভাষার প্রচলন ছিল। অনুমান করা যেতে পারে যে এই সব অঞ্চলে আর্যভাষার প্রচলন হলেও সম্ভবতঃ পূর্ববর্তী অনার্য ভাষাসমূহের প্রভাবে পরবর্তী আর্যভাষার সংগঠনে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে, যার প্রমাণ ধরা পড়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন উপভাষায় বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গীয়তে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অনার্যভাষাসমূহকে বিভিন্ন অঞ্চলের বাংলাভাষার উপস্তর বলা যেতে পারে। সম্ভবতঃ ঐ কারণেই বাংলাদেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক বাংলা উপভাষায় ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনির অভাব, স্পৃষ্ট তালব্য ধ্বনির পরিবর্তে ঘৃষ্ট বা উষ্ম দন্ত্য ধ্বনির ব্যবহার, স্বরধ্বনিতে সানুনাসিকতার অভাব এবং তাড়নজাত মূর্ধন্য ধ্বনির অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। এই সব ধ্বনিগত উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি আর্যপূর্ব অনার্যভাষাসমূহের ধ্বনি সংগঠনের কারণে হতে পারে। এ সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত নিম্নরূপ :

> বাঙলাদেশে আর্য-ভাষার আগমনের পূর্বে, কোল আর দ্রাবিড়, আর উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ভোট-চীনা, এই তিনটি ভাষারই অস্তিত্বের প্রমাণ পাই ··· আর্যদের আগমনের কালে যে ভাষা দ্রাবিড় আর কোল-ই ছিল, এই অনুমান মেনে নিতে প্রবৃত্তি হয় ··· সমস্ত উত্তর-ভারতময়—বাঙলাদেশকেও ধ'রে—দ্রাবিড়—আর কোল-ভাষী লোকদের অবস্থানের পক্ষে প্রমাণ আর যুক্তি বিস্তর আছে,[৫]

বিশ শতকের ত্রিশ ও চল্লিশ দশকে সাংগঠনিক ভাষাতত্ত্বের উদ্ভবের পরে অধিকতর সংখ্যায় বিভিন্ন উপভাষার সংগঠনের বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ পাওয়া গিয়েছে। সাংগঠনিক বিশ্লেষণে উপভাষা বৈশিষ্ট্য কেবল তথ্য হিসেবে উপস্থাপিত নয় বরং যে-নিয়মে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট পারস্পরিক-সম্পর্কে-সম্পর্কিত, সেগুলোর ওপরেও আলোক নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সাংগঠনিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন উপভাষার সমান্তরাল ব্যবস্থাসমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনায় বিভিন্ন উপভাষার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য স্ফুটনে ভাষাতাত্ত্বিক তত্ত্বের দিগন্ত বিস্তৃত হয়েছে। সাংগঠনিক বিশ্লেষণের ফলে উপভাষাতত্ত্বে নতুন নতুন সংজ্ঞা ও ধারণা সংযোজিত হয়েছে, যেমন 'ডায়াসিস্টেম'—গ্রাফের সাহায্যে দুইটি ভাষা বা উপভাষা ব্যবস্থার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যকে প্রদর্শিত করা। 'ইডিয়লেক্ট'—একজন ভাষাভাষীর বাক-বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করা প্রভৃতি। দ্বিভাষী সম্প্রদায়ে ভাষা ব্যবস্থার অবস্থা পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি নির্ণয় এবং সহ-অবস্থানের কারণে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বা উপভাষা সংগঠনের

৩ Winfred P. Lehmann, 'Broadening of Language Materials', *Historical Linguistics*, New York, Holt, Rinehart and Winston, 1966, P126-128

৪ Milka Ivich, *Ibid*

৫ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙলাভাষা আর বাঙালী জাতের গোড়ার কথা', বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫০, পৃ ৩৩

পারস্পরিক প্রভাব নির্ণয়ের মাধ্যমে ভাষাতাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে আসা সম্ভবপর হয়েছে। মার্কিন উপভাষাবিদ্ হ্যানস্ কুরাথ্, র‍্যাভেন ম্যাকডেভিড এবং উইলিয়ম লেবভ ভাষার বৈচিত্র্য অবলোকনে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছেন, তাঁরা ভাষার ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক বৈষম্য অপেক্ষা সামাজিক বৈচিত্র্য অবলোকনে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন।

বিংশ শতাব্দীতে জার্মানী, ফ্রান্স ও ইতালিতে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভাষার বৈচিত্র্য অনুসন্ধান করে নতুন তথ্য পাওয়া গিয়েছে। সোয়াবিয়ান উপভাষাবিদ্ ফিশার আবিষ্কার করেছেন যে দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মানীর আঞ্চলিক উপভাষার সীমানা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক সীমারেখার সঙ্গে অভিন্ন। জার্মানী, ফ্রান্স ও ইতালীর উপভাষা সীমানাগুলির তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে জাবের্গ দেখিয়েছেন যে ঐ সব দেশের উপভাষা বৈচিত্র্য নির্দিষ্ট এলাকার রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি। ফ্রান্সে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা, গত কয়েক শতাব্দী যাবত একক কেন্দ্রীয় শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে ঐ দেশে উপভাষার সীমারেখা খুব স্পষ্ট নয়, বিভিন্ন উপভাষার পার্থক্যও অস্পষ্ট, ব্যতিক্রম কেবল দূরবর্তী অঞ্চলসমূহ। ইতালিতে এক সময়ে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় শক্তি শাসিত নগর রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল ফলে বিভিন্ন উপভাষার সীমারেখাও বেশ স্পষ্ট। জার্মানীতে রাষ্ট্রনৈতিক ভাঙ্গাগড়া গেছে বেশী, অনেক ছোট ছোট রাজ্য ছিল সে দেশে আর সেখানে ছোট ছোট উপভাষার সংখ্যাও বেশী। ঐসব উপভাষাগুলি আবার দীর্ঘ মিশ্র অঞ্চল দ্বারা বিচ্ছিন্ন। জার্মানীর উপভাষা পরিস্থিতি অতীতের রাজনৈতিক স্থিতিহীনতা এবং নিকট অতীতের আঞ্চলিক পটপরিবর্তনের প্রতিফলন।

সমাজ কাঠামো বা সামাজিক কার্যকারণ কিভাবে ভাষাকে প্রভাবিত করে লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড তা বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁর মতে মানবসমাজের ভাষাতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য জন-বসতির গভীরতার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং ভাষাভাষীর পারস্পরিক যোগাযোগের ব্যাপকতার সঙ্গে সম্পর্কিত। পূর্বে ভাষাতাত্ত্বিকরা ভাষা ও পরিবেশগত কারণের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজতেন, ব্লুমফিল্ড মানুষের মধ্যে যোগাযোগের ব্যাপারটি ভাষাতাত্ত্বিক ও অভাষা-তাত্ত্বিক বিষয়ের মধ্যে মাধ্যমরূপে চিহ্নিত করেছেন। ভাষার মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক এমন কি ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত বলে তিনি মনে করেননি, ঐসব বিষয় মানুষের মৌখিক যোগাযোগকে যতটা চালিত করতে পারে ততটুকুই তা ভাষাকে প্রভাবিত করে।[৬]

অধুনা সামাজিক ভাষাতত্ত্বের লক্ষ্য ভাষাসমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যবহৃত ভাষার ভিত্তিতে সামাজিক ব্যবস্থাসমূহ তুলনা করা। ভাষার কোন্ রূপ কত লোক কি পরিবেশে ব্যবহার করে থাকে এবং ভাষার বিভিন্ন রূপের প্রতি স্থানীয় মনোভাব কি তা গুরুত্বের সঙ্গে পর্যালোচনা করা হয়। ঐ বিষয়টি অনুধাবনের জন্যে ভাষার দ্বিমাত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়। যার একটি ভাষার আভ্যন্তরীণ রূপ, অপরটি যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে ভাষার ভূমিকা। ভাষার প্রথম বৈশিষ্ট্যে যেসব বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য যাচাই করা হয় সেগুলো হল, 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড' বা শিষ্টভাষা, 'ভারনাকুলার' বা লোকভাষা, ধ্রুপদী এবং মিশ্রভাষা। ভাষার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বা যোগাযোগ মাধ্যম রূপে যেসব বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য খোঁজা হয় তা হল, ব্যক্তি বা শ্রেণীর ভাষা, বৃহত্তর যোগাযোগের ভাষা, পেশা বা ব্যবসা বাণিজ্যের ভাষা ইত্যাদি।[৭]

---

৬ Leonard Bloomfield, *Language*, New York, Holt, Rinehart & Wnston, 1933

৭ John J. Gumperz, Introduction, *Directions in Socio Linguistics*, New York, Holt, Rinehart & Winston, 1972, P 1-25

ঐ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আধুনিক কালে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জরীপ চালান হয়, এ সব জরীপ নাগরিক পরিবেশে ভাষার পরিবর্তন সম্পর্কে আলোকপাত করে। ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডের ভাষাতাত্ত্বিক জরীপ থেকে দেখা যায় যে যেখানে শিক্ষার হার খুব বেশী সেখানে শিষ্ট ভাষার সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষারও সহ অবস্থান রয়েছে। স্কটল্যাণ্ডে শিষ্ট ভাষার বৈশিষ্ট্য স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষার বৈশিষ্ট্য থেকে ভিন্নতর হওয়ায় বোঝা যায় যে ভাষার বৈচিত্র্য মূলতঃ সামাজিক সম্পর্কের ওপরেই নির্ভরশীল, আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক প্রভাব সেখানে পরোক্ষ। আমেরিকায় ভাষাতাত্ত্বিক উইলিয়ম লেবভ নিউইয়র্ক মহানগরীর ইংরেজী ভাষার বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে প্রশ্নমালা ও উত্তর সংগ্রহের প্রচলিত উপভাষা জরীপ পদ্ধতি বর্জন করে নতুন রীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তিনি এক একটি অঞ্চলের আদি বাসিন্দাদের মধ্য থেকে বিশেষ নির্ভরযোগ্য উপভাষাভাষী বেছে নিয়ে তাদের ভাষার সম্ভাব্য সকল বৈশিষ্ট্য জরীপ করেন। শুরুতে তিনি নির্দিষ্ট এলাকার এমন কয়েকটি ধ্বনিতাত্ত্বিক ও ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য নির্বাচন করেন যা দৈনন্দিন জীবনে বহুল ব্যবহৃত এবং ঐ এলাকার মানুষের ব্যক্তিভঙ্গীর বৈচিত্র্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ, সর্বোপরি যার মধ্যে সামাজিক তথ্যাদি সর্বাধিক ধরা পড়ে। তিনি বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যগুলি লিপিবদ্ধ করেন, প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তির কাছ থেকে তার ভাষাতাত্ত্বিক নমুনা সংগ্রহ করেন এবং বিভিন্ন প্রকার ঘরোয়া ও আনুষ্ঠানিক পরিবেশে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে তিনি তার উপাদানকে সম্প্রসারিত করেন। এই পদ্ধতিতে ভাষাভাষীর সমাজ শ্রেণীগত ও জাতি-গত বৈচিত্র্য নির্ভরযোগ্যরূপে ধরা পড়ে। উইলিয়াম লেবভ তার জটিল ও কার্যকর পদ্ধতির মাধ্যমে ভাষার সমসাময়িক পরিবর্তনকে সনাক্ত এবং দৃশ্যমান করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।[৮] বর্তমানকালে ইংরেজী ভাষার স্বরধ্বনি পরিবর্তনের গতি প্রকৃতি সমগ্র ইংরেজী ভাষাভাষী জগতের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জরীপ ও বিশ্লেষণ করতে পেরেছেন। লেবভের যুগান্ত-কারী 'নিউইয়র্ক সমীক্ষা' আমেরিকায় সামাজিক ভাষাতত্ত্বের নতুন ঐতিহ্য ও ধারা সৃষ্টি করেছে। উপভাষাতত্ত্ব আর কেবল মাত্র আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহ ও সংকলন নয় বা ভাষার ভৌগোলিক বৈষম্য অনুসন্ধান নয় বরং ভাষার বহুমুখী সামাজিক ভূমিকার সমীক্ষা।

উপভাষাতত্ত্বের বিবর্তনের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বাংলাদেশে প্রচলিত বাংলা ভাষার বৈচিত্র্য বিশ্লেষণের যে সব প্রয়াস হয়েছে তার আলোচনা করতে পারি। পর্তুগীজ ধর্মযাজক মানোএল দা আস্সুম্পসাঁও ১৭৩৪ খ্রীস্টাব্দে 'ভোকাবুলারিও এম্ ইদিওমা বেন্গাল্লা এ পর্তুগীজ' নামক বাংলা ভাষার যে প্রথম ব্যাকরণটি ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগণায় বসে রচনা করেছিলেন তাতে ভাওয়াল অঞ্চলের উপভাষা ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৭৩৫ খ্রীস্টাব্দে রচিত উক্ত লেখকের 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ' গ্রন্থেও ভাওয়ালের উপভাষা ব্যবহৃত হয়। শতাধিক বৎসর পূর্বে পূর্ববাংলার উপভাষার রূপ কেমন ছিল তার যৎকিঞ্চিৎ নমুনা মানোএলের 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ' গ্রন্থে পাওয়া যায়। গ্রন্থটিতে গুরু ও শিষ্যের নিম্নরূপ কথোপকথন রয়েছে :

শি : পূজ্য হোক সিদ্ধি পরম নির্মল ধর্ম
গু : তিনি তোমার আশীর্বাদ দেক, এবং তোমারে ভাল করুক ;
আইস পোলা, তুমি কেটা ?
শি : আমি খ্রীস্তাও, পরমেশ্বরের কৃপায়।
গু : কোথায় যাও ?
শি : বারিতে যাই।
গু : তোমার বারি কোথায় ?

৮ John J. Gumperz, Introduction, *Directions in Socio Linguistics*, New York, Holt, Rinehart & Winston, 1972, P 1-25

শি : ভাওয়াল দেশে; আমি তোমার রাইয়ত। নাগরিতে বসি।
গু : আমি তো সেখানে যাই। আমার সঙ্গে আইস। [৯]

মানোএলের 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ' গ্রন্থের নাম পৃষ্ঠাতেই উল্লেখ আছে :

> ফাদার মনোএল-দা-আস্সুম্পসাঁও লিখিয়াছেন এবং বুঝাইয়াছেন বাঙ্গালাতে ভাওয়াল দেশে, সন, হাজার সাত শত পাইনতিশ বসসর খ্রীস্টর জর্ম বাদে।[১০]

গ্রন্থটিতে গুরু ও শিষ্যের সংলাপ থেকে শতাধিক বৎসর পূর্বের পূর্ববঙ্গের উপভাষার নিম্ন প্রকার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য উদ্ধার করা যায়। ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য—পশ্চাৎ নিম্নমধ্য গোলাকৃতি 'অ' স্বরধ্বনির স্থানে পশ্চাৎ উচ্চ গোলাকৃতি 'উ' ধ্বনি, যথা শহর > শুহর। পশ্চাৎ উচ্চ মধ্য গোলাকৃতি 'ও' ধ্বনির স্থানে পশ্চাৎ উচ্চ গোলাকৃতি 'উ' ধ্বনি, মোটা > মুটা। অঘোষ স্বল্পপ্রাণ স্পৃষ্ট কণ্ঠ 'ক' ধ্বনির স্থানে ঘোষ স্বল্পপ্রাণ 'গ' ধ্বনি, কাক > কাগ, শাক > শাগ। শব্দের আদি অবস্থানে উষ্ম তালব্য ব্যঞ্জন 'স/শ' স্থানে 'হ', সকল > হগল। স্বরমধ্যবর্তী অঘোষ স্বল্প ও মহাপ্রাণ স্পৃষ্ট কণ্ঠ 'ক' ও 'খ' স্থানে 'হ', রাখাল > রাহআল। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ' গ্রন্থে পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার বর্তমানে প্রচলিত রূপ 'কইন্যা' বা 'রাইখ্যা' নেই আছে 'কনিয়া' ,'রাখিয়া' তবে 'মধ্যে' শব্দের রূপ সেখানে 'মইধে'। শব্দ মধ্যে 'ই' আগমের পূর্ববঙ্গীয় রীতির উপস্থিতি রয়েছে, যেমন বোন > বইন, চার > ছাইর, ষাট > ষাইট ইত্যাদি।

রূপতত্ত্বে পূর্ববঙ্গীয় রীতিতে কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তির ব্যবহার 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ' গ্রন্থে লক্ষণীয়, যেমন 'মাইয়াএ মরিয়া গেল,' 'মাতাএ ছাওয়ালের উপরে প্রতি রাইতে সিদ্ধি ক্রুশ করিয়াছিল' ইত্যাদি।

বাক্যরীতিতেও গ্রন্থটিতে পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার রীতি পাওয়া যায় যেমন, 'আইস পোলা তুমি কেটা?', 'তুমি নি আস্থার নিরুপণ জান?' 'হয় জানি।' ইত্যাদি। উক্ত গ্রন্থে পূর্ববাংলার উপভাষায় ব্যবহৃত অনেক শব্দ পাওয়া যায়, যেমন যথা, ছাওয়াল, মাইয়া, পোলা, ফাল, লগে ইত্যাদি।[১১]

বাংলা ভাষার আঞ্চলিক বৈচিত্র্য বা উপভাষা বৈশিষ্ট্য নিয়ে সামগ্রিক আলোচনায় জর্জ গ্রীয়ার্সনের 'লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' (পঞ্চম খণ্ড, প্রথম ভাগ) গ্রন্থটি পথিকৃৎ। গ্রীয়ার্সন অবলম্বনে মুনীর চৌধুরী আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে বাংলাদেশের বাংলাভাষার নিম্নোক্ত উপভাষার শ্রেণী নির্ণয় করেছেন,

উত্তরবঙ্গীয় : দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া ও পাবনা

রাজবংশী : রংপুর

পূর্ববঙ্গীয় : ক. ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, বরিশাল, পটুয়াখালি

---

৯ সবিতা চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালা ইউরোপীয় লেখক, কলিকাতা, ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৭২, পৃ ৯৩-৯৯

১০ ঐ

১১ ঐ

খ. ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা

গ. সিলেট

দক্ষিণবঙ্গীয়: চট্টগ্রাম, নোয়াখালি।

আধুনিক শিষ্ট বা কথ্য বাংলার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে ঐ সব উপভাষার নিম্নরূপ সাধারণ ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য গ্রীয়ার্সন অনুসরণে মুনীর চৌধুরী নির্দেশ করেছেন। ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য: তাড়নজাত মূর্ধন্য ব্যঞ্জন 'ড়' স্থানে দন্ত্য 'র', যথা বড় > বর। তাড়নজাত দন্ত্য 'র' স্থানে পার্শ্বিক 'ল' যেমন, শরীরে > শরীলে। রাজশাহী অঞ্চলে বিশেষতঃ চাপাই নওয়াবগঞ্জ এলাকায় উষ্ম তালব্য 'শ' ও উষ্ম দন্ত্য 'স' ধ্বনির মধ্যে বিভ্রান্তি। স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে সম্মুখ প্রসৃত উচ্চমধ্য 'এ' এবং নিম্নমধ্য 'এ্যা' ধ্বনি, পশ্চাৎ গোলাকৃতি নিম্নমধ্য 'অ' এবং উচ্চমধ্য 'ও' ধ্বনির মধ্যে বিভ্রান্তি। রাজবংশী বা রংপুরের উপভাষায় অঘোষ মহাপ্রাণ তালব্য ব্যঞ্জন 'ছ' এবং উষ্ম দন্ত্য 'স', ঘোষ স্বল্পপ্রাণ তালব্য 'জ' এবং উষ্ম দন্ত্য 'য' নাসিক্য দন্ত্য 'ন' এবং পার্শ্বিক 'ল', ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্ত্য 'দ' এবং ঘোষ মহাপ্রাণ দন্ত্য 'ধ' ধ্বনির মধ্যে ব্যতিক্রম পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গীয়তে স্পৃষ্ট তালব্য ব্যঞ্জন 'চ' 'ছ' 'জ' 'ঝ'এর পরিবর্তে ঘৃষ্ট বা উষ্ম 'ছ' এবং 'য' ধ্বনি পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গীয়তে কোন কোন অঞ্চলে একটি স্বরতন্ত্রীয় স্পৃষ্ট ধ্বনি পাওয়া যায়। সিলেটীতে স্পৃষ্ট কণ্ঠ 'ক' এবং স্পৃষ্ট ওষ্ঠ্য 'ফ' ধ্বনির ঘর্ষণজাত রূপ পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গীয়তে অঘোষ স্বল্পপ্রাণ 'ক' এবং মহাপ্রাণ 'খ' মধ্য অবস্থানে উষ্ম কণ্ঠ 'হ' ধ্বনিতে পরিণত হয়, আদি অবস্থানে 'হ' ধ্বনি উহ্য থাকে। দক্ষিণ বঙ্গীয়তে স্পৃষ্ট কণ্ঠ 'ক' ধ্বনি উষ্মতাপ্রাপ্ত হয়। পূর্ববঙ্গীয়তে বর্গের চতুর্থ ধ্বনি ঘোষ মহাপ্রাণ 'ঘ', 'ঝ', 'ঢ', 'ধ' 'ভ' যথাক্রমে স্বল্পপ্রাণ 'গ' উষ্ম 'য', স্বল্পপ্রাণ 'ড' ও 'দ' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়।

মুনীর চৌধুরী গ্রীয়ার্সন অনুসরণে বাংলাদেশের বিভিন্ন উপভাষার নিম্নরূপ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন: উত্তরবঙ্গীয়তে কর্তার বহুবচনে 'তে' বিভক্তি, যেমন—ছাওতে। কর্মে 'দেক', যেমন—চাকরদেক; গৌণকর্মে 'গুণে' যেমন—আমাকগুণে, বাপাকগুণে। অপাদানে 'ত', যেমন—কষ্টৈত, দেশত। ক্রিয়াপদে অসমাপিকা 'এ্যা', যেমন—করা, হয়া। উত্তমপুরুষে ভবিষ্যৎকালে 'ইম' 'আম', যেমন—বলিম, করিম।

রাজবংশীতে কর্তায় বহুবচনে 'গুলা', 'গিলা', যেমন—বালকগুলা। সম্বন্ধের বহুবচনে 'ঘর'—চাকরেরঘর। কর্মকারকে 'ক' এবং সম্বন্ধে 'কার'—বালককার। অপাদানে 'অত', 'ওত'—বালকত্। ক্রিয়াপদের রূপ, প্রথম পুরুষ বর্তমান ও পুরাঘটিত 'ও', যথা—মুই আছোঁ। অতীতে 'নু', আছিনু। ভবিষ্যতে 'ম', 'মু', 'মো', যথা—থাকিমু, থাকিম্, থাকমো, থাকম্। দ্বিতীয় পুরুষের অতীতে 'লু', 'ল্লু', ভবিষ্যতে 'বু', যেমন—তুই কাইল্লু, তুই করবু। পূর্ববঙ্গীয়তে—কর্মে 'এরে', 'রে', বাপেরে। সম্বন্ধের বহুবচনে 'গো' ছাকরগো, তাগো। কর্মের বহুবচনে 'রারে', আমরারে, তোমরারে। অপাদানে 'অ', 'ত',—দিল, গলত।

ক্রিয়াপদের রূপ, প্রথম পুরুষ ভবিষ্যৎ—'মু', কমু। ময়মনসিংহে 'আম'—করবাম। তৃতীয় পুরুষ অতীতে 'ল'। অসমাপিকাতে 'আ', 'ইয়া'—করিয়া, কইরা। কুমিল্লায় দ্বিত্ব—বইল্লা, উইঠ্ঠা। কুমিল্লায় অনির্দেশক 'তো' 'তাম'—করতো, কইতাম। ময়মনসিংহে 'অত', 'বার'—বারত, আইগাইবার। সন্দীপে 'অন'—করন। সিলেটীতে সম্বন্ধের একবচনে 'অর'—গরর। অপাদানে 'ত', 'ও'—গরত, গরো। কর্তায় বহুবচনে 'আইন'—গরাইন, 'টাইন', গরটাইন। অতীতে মধ্যমপুরুষে 'লাই'—দেখলাই। তৃতীয়াতে 'লা'—দেখলা। ভূতার্থ

অনির্দেশককে 'তাম', 'তায়', 'তা', 'তাইন'—খাইতাম, খাইতায়, খাইতা, খাইতাইন। ঘটমান বর্তমানে উত্তমপুরুষে 'ত্রাম', 'ইয়ার', 'রাম'—যাইত্রাম, যাইয়ার, যাইরাম। দ্বিতীয় পুরুষে 'ত্রায়', 'ত্রে',—যাইত্রায়। নির্দেশাত্মক 'উইন', 'উকা', 'উক্কা'। অনির্দেশক—'তায়', 'তে', 'তা', যেমন—তুই যাইতায় ছাও, হে যাইতো ছায়, তাইন যাইতা ছাইন ইত্যাদি।

দক্ষিণ পূর্ববঙ্গীয়র চট্টগ্রামীতে কর্তায় 'এ', অপাদানে 'তুন', সম্বন্ধে 'অর', অপাদানে 'অত', বহুবচনে 'গুণ', 'উন', যথা—কুঁউরগুণ; বর্তমান কালে প্রথম পুরুষে 'ব', তৃতীয় পুরুষে 'তান'। অতীতকালে প্রথম পুরুষে '(গ)ইয়ম', 'গে', যথা—করগিয়ম, করিয়াম, করগি, অথবা করজিয়ম ইত্যাদি। দ্বিতীয় পুরুষে '(গ)ইয়', 'লা'; তৃতীয় পুরুষে '(গ)ইয়'; ভবিষ্যত কালে '(গ)ইউম', 'বঅ', 'যাম'; দ্বিতীয় পুরুষে 'বে', অনুজ্ঞা-'অ' না-বাচক 'ইঅ', যেমন—নকরিঅ। সন্মানবাচক—করওক। অসমাপিকা 'ইয়ারে', যথা—গরিয়ারে।

বাংলাদেশের উপভাষাসমূহে রূপতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য অধিক এবং তা নিম্নোক্ত তিনটি ক্ষেত্রে সর্বাধিক,—সর্বনাম, কারক বিভক্তি, ক্রিয়া বিভক্তি। যেমন সর্বনামে 'আমি'র উপভাষা রূপ উত্তরবঙ্গে 'মুই', নোয়াখালিতে 'আই'। 'আমার', উত্তরবঙ্গে 'মোর', নোয়াখালিতে 'আর'। 'আমাদের' উত্তরবঙ্গে 'হামার', ময়মনসিংহে 'আমরার', কুমিল্লায় 'আমাগো', বরিশালে 'মাগো', দক্ষিণবঙ্গে 'আমরার' ইত্যাদি।

কারকবিভক্তিতে 'চাকরদের', উত্তরবঙ্গে 'চাকরদেক', পূর্ববঙ্গীয়তে 'ছাঅরগো', দক্ষিণ-বঙ্গে 'ছঅরগুণ'। 'গলায়', পূর্ববঙ্গে 'গলাত'।

ক্রিয়া বিভক্তিতে 'বলব', উত্তরবঙ্গে 'বলিম', পূর্ববঙ্গে 'কমু', দক্ষিণবঙ্গে 'খইয়ুম' ইত্যাদি।[১২]

গ্রীয়ার্সনের উপাদান বাংলাদেশের সমস্ত অঞ্চল থেকে সংগৃহীত তথ্যভিত্তিক নয়, যেমন ঢাকা জেলা থেকে কেবল মানিকগঞ্জের নমুনা সংগৃহীত হয়েছিল, ঢাকা শহরে প্রচলিত উপভাষার নমুনা সেখানে নেই। ফলে গ্রীয়ার্সনের জরীপে আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক দৃষ্টিকোন থেকে উপভাষার সীমানা নির্ণয় ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটন বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ণাঙ্গ নয়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও বাংলা ভাষার উপভাষা বৈচিত্র্য পূর্ণাঙ্গভাবে নির্ণয় করেননি তবে বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাসে ঐ প্রসঙ্গে তিনি কিছু মূল্যবান মতামত রেখেছেন। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত সংক্ষেপে নিম্নরূপ: বাংলা উপভাষাগুলি একটিমাত্র প্রত্নভাষার বিবর্তিত রূপ নয়, বাংলার উপভাষাগুলি সাধুভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত। বাংলার বদ্বীপ অঞ্চলের নিজস্ব কোন উপভাষা নেই, বিভিন্ন উপভাষার পারস্পরিক প্রভাবে এ অঞ্চলের বাংলা ভাষা গড়ে উঠেছে। বাংলা উপভাষাগুলির যে চার প্রধান ভাগ—রাঢ়, বরেন্দ্র বা পুণ্ড্র, বঙ্গ এবং কামরূপ তার মধ্যে পূর্ব প্রত্যন্ত বঙ্গে অর্থাৎ সিলেট, ত্রিপুরা, নোয়াখালি এবং চট্টগ্রামের উপভাষাগুলিতে এমন সব ধ্বনিতাত্ত্বিক এবং রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আছে যা বাংলা ভাষার অন্য কোন উপভাষায় নেই। পূর্ব প্রত্যন্ত বঙ্গের উপভাষার এই বৈশিষ্ট্যের কারণ ঐ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিহিত। উপভাষা গুলির ধ্বনিতাত্ত্বিক রূপতাত্ত্বিক সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য ছাড়া আভিধানিক ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়, অপনিহিত 'ই' ধ্বনি রাঢ় বা অন্যান্য অঞ্চলের উপভাষা অপেক্ষা বঙ্গ ও বরেন্দ্র উপভাষায় অধিকতর রক্ষিত, এই দুটি উপভাষার স্বরধ্বনি-ব্যবস্থা অধিকতর রক্ষণশীল, মধ্যযুগের বাংলা ভাষার লক্ষণ 'বঙ্গ উপভাষাগুলি'তে সবচেয়ে বেশি অটুট রয়েছে।

১২ Munier Chowdhury', *International Journal of American Linguistics*, July, 1960 P. 64-78

স্বরমধ্যবর্তী মহাপ্রাণ ধ্বনির মহাপ্রাণতাহীনতার ফলে বঙ্গ উপভাষাগুলিতে নতুন বৈশিষ্ট্যের আগম ঘটেছে। পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব বাংলার উপভাষাগুলিতে আদ্য ও মধ্য অবস্থানে স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনের ব্যাপক উষ্মীভবন একটি বিশিষ্ট লক্ষণ এবং এই বৈশিষ্ট্য এই উপভাষাসমূহকে বাংলার অন্যান্য উপভাষা থেকে পৃথক করেছে।[১৩]

বাংলাদেশে আঞ্চলিক ভাষার অভিধান প্রণয়ন ও প্রকাশের কৃতিত্ব বাংলা একাডেমীর, এ অভিধানের প্রধান সম্পাদক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। অভিধানটি বস্তুতঃপক্ষে আঞ্চলিক শব্দের। প্রথমে ছিয়ানব্বই জন সংগ্রাহক প্রায় একুশ হাজার শব্দ সংগ্রহ করে পাঠিয়েছিলেন, পরে আবার চারশত তিপ্পান্ন জন সংগ্রাহক একলক্ষ ছেষট্টি হাজার দুইশত ছেচল্লিশটি আঞ্চলিক শব্দ প্রেরণ করেন। সংগ্রাহকদের অর্ধাংশ ছিলেন অধ্যাপক ও শিক্ষক, এক চতুর্থাংশ ছাত্র, আর এক চতুর্থাংশ বিভিন্ন কর্মজীবী। বাংলাদেশের সব জেলা থেকেই আঞ্চলিক শব্দ সংগৃহীত হলেও, ঢাকা শহরে অবস্থানকারী সংগ্রাহকেরাই ছিলেন সংখ্যাধিক্য, যদিও তাঁরা বিভিন্ন জেলার শব্দ সংগ্রহ করে পাঠিয়েছিলেন। ঢাকা শহরের বাইরে কোন কোন জেলার সংগ্রাহকদের সংখ্যা তিন চার জনের বেশী নয়। অধিকাংশ সদস্যই ধ্বনিতত্ত্ব জ্ঞান বা প্রশিক্ষণহীন ফলে শব্দের যথাযথ উচ্চারণ লিখিবদ্ধ করার বা ধ্বনিবৈশিষ্ট্য রক্ষার ক্ষমতাবিহীন কাজেই বিভিন্ন অঞ্চলের ধ্বনিবৈশিষ্ট্য সংগৃহীত শব্দাবলীর মধ্যে রক্ষিত হয়নি। ঐসব কারণে সংগৃহীত শব্দের মধ্যে পঁচাত্তর হাজারের বেশী শব্দ রাখা যায়নি। আলোচ্য অভিধানটির ভূমিকায় বাংলাদেশের বিভিন্ন উপভাষার শ্রেণীবিন্যাস বা বিভিন্ন উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় নেই, সংগৃহীত শব্দাবলীর ভিত্তিতে কোন ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এ অভিধানের ভূমিকাতে সংযোজিত হয়নি। তবে অভিধানের প্রধান সম্পাদক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ভূমিকাতে গ্রীয়ার্সন কৃত বাংলা উপভাষার প্রাচ্য বিভাগের পূর্বদেশী ও দক্ষিণ-পূর্ব শাখার নিম্নোক্ত তালিকাটি উদ্ধৃত করেছেন:

১। পূর্বদেশী—ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বাখরগঞ্জ, দক্ষিণ-পূর্ব ফরিদপুর, সিলেট

(ক) ইহার একটি প্রশাখা-পূর্বকেন্দ্রিক-যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর (দক্ষিণ পূর্বাংশ ব্যতীত)

(খ) আর একটি প্রশাখা—হাজং (ময়মনসিংহ জেলা)

২। দক্ষিণপূর্ব—নোয়াখালী, চট্টগ্রাম

(ক) ইহার একটি প্রশাখা চাকমা।[১৪]

গ্রীয়ার্সনের উপভাষা বিভাগ সম্পর্কে ভূমিকায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মন্তব্য:

'গ্রীয়ার্সন সাহেব এই সমস্ত বিভাগ, শাখা ও প্রশাখার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি বিস্তৃতরূপে প্রদর্শন করেন নাই; কিন্তু ইহার প্রয়োজন আছে।'[১৫]

---

১৩ Suniti Kumar Chatterji, *The Origin and Development of Bengali Language*, Vol. I, London, George Allen & Unwin Ltd. 1970, P 137-147

১৪ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, (প্রধান সম্পাদক), পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, ঢাকা, বাঙলা একাডেমী, ১৯৬৫

১৫ ঐ

অবশ্য মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ও ঐ প্রয়োজন মেটাননি, তিনি নিম্নরূপ মন্তব্যসহ অতি সংক্ষেপে গ্রীয়ার্সন সাহেবের মতামতই উদ্ধৃত করেছেন :

'আমি গ্রিয়ার্সন সাহেবের শ্রেণীবিভাগ আপাততঃ স্বীকার করিয়া লইয়া ...এই সমস্ত শ্রেণীর বিশিষ্ট লক্ষণগুলি তাঁহার মতানুযায়ী নিম্নে প্রদান করিতেছি।...

(ক) পূর্বদেশী শাখা

ধ্বনিতত্ত্ব। প্রাচ্য বিভাগের সাধারণ ধ্বনিতত্ত্ব, চ বর্গের দন্ত্য-তালব্য উচ্চারণ, শ, ষ, স স্থানে (যুক্ত বর্ণ ব্যতীত) হ উচ্চারণ, মূল হ কারের লোপ। মহাপ্রাণ ঘোষ বর্ণের মহাপ্রাণতা লোপ এবং ড়, ঢ়, স্থানে র।

রূপতত্ত্ব। প্রাচ্য বিভাগের সাধারণ লক্ষণ রক্ষিত।

(অ) পূর্ব কেন্দ্রিক প্রশাখা। গ্রিয়ার্সন সাহেব যশোর, খুলনা, ফরিদপুরের (দক্ষিণ-পূর্বাংশ ব্যতীত) কথ্য ভাষাকে পূর্বদেশী শাখার একটি প্রশাখারূপে নির্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু ধ্বনিতত্ত্বে একমাত্র ছ স্থানে S এবং J স্থানে Z উচ্চারণ ভিন্ন এবং রূপতত্ত্বে কর্মকারকের একবচনের বিভক্তি 'রে' এবং সকর্মক ক্রিয়ার অতীত কালে প্রথম পুরুষে 'ল' ভিন্ন ইহা বহু বিষয়ে পাশ্চাত্য বিভাগের বিশিষ্ট ধ্বনি ও রূপতত্ত্বের সহিত অভিন্ন। এইজন্য ইহাকে পাশ্চাত্য বিভাগের পূর্বশাখারূপে গ্রহণ করা কর্তব্য। ইহার একটি বিশেষত্ব যেতে খেতে ইত্যাদি তুমর্থক ক্রিয়া বিভক্তির 'তে' স্থানে 'তি' যথা—করতি, খাতি, অধিকরণে ই কার উ কারের পরস্থিত এ কার স্থানে ই কার (যথা—পিঠি, গুড়ি, চুলি) এবং সম্বন্ধের এর স্থানে 'ইর' (যথা—পিঠির, গুড়ির, চুলির)।

(খ) দক্ষিণ-পূর্বশাখা। নোয়াখালী এবং চট্টগ্রামের উপভাষার মধ্যে মাত্র 'প' স্থানে '*f*' এবং প্রথম পুরুষের সর্বনামের স্ত্রীলিঙ্গের রূপ (নোয়াখালীতে হেতি; চট্টগ্রামে তেই, তাই, হিতি) ভিন্ন আর কোনও সাধারণ লক্ষণ নাই।.. নোয়াখালীকে পূর্বদেশী শাখার এলাকাধীন করা যাইতে পারে। ইহার স্থানীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে ড় ধ্বনি রক্ষিত আছে। ..আমরা কেবল চট্টগ্রামের উপভাষাকে এই দক্ষিণপূর্ব শাখাভুক্ত মনে করি।.. চট্টগ্রামী উপভাষার ধ্বনিতত্ত্ব এই যে,

(ক) ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি রক্ষিত আছে, যেমন ঘর, ঝার, (ঝড়), ধান, ভাত ইত্যাদি।

(খ) ইহার আদি হ রক্ষিত আছে, যেমন হাত, হাতী ইত্যাদি।

(গ) পদমধ্যবর্তী ম অনুনাসিক হয়, যথা আঁই (আমি), আঁর (আমার) তুঁই (তুমি), কুঁআর (কুমার), ছুঁই (ছিম), হুঁউক (শামুক) ইত্যাদি।

(ঘ) পদমধ্যবর্তী ব্যঞ্জনবর্ণ প্রায়ই লোপ বা বিকৃত হয় যথা—তঅন (তখন), ডাই (ডাকিয়া), খুই (খুলিয়া) ইত্যাদি। রূপতত্ত্বে ইহাতে সর্বনামের প্রথম পুরুষের স্ত্রীলিঙ্গে তেই, তাই, হিতি আছে এবং

নিষেধার্থক অব্যয় 'ন' ক্রিয়ার পূর্বে বসে, যথা ন যাই, ন আসিল (ছিল না)।[১৬]

গ্রীয়ার্সন অবলম্বনে বাংলাদেশের বিভিন্ন উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন ছাড়া শহীদুল্লাহ্ সাহেব বাংলাদেশের কয়েকটি উপভাষার কিছু ধ্বনি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তার মতামত দিয়েছেন। সিলেট এবং চট্টগ্রামের 'ক' ধ্বনির আরবী 'খে' ধ্বনির এবং ময়মনসিংহ, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় 'জ' ধ্বনির আরবী 'যে' ধ্বনির অনুরূপ উচ্চারণ সম্পর্কিত কোন কোন মহলের ধারণার খণ্ডন করে তিনি লিখেছেন,

> প্রথমতঃ এইরূপ বিকৃত উচ্চারণ হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ নির্বিশেষে স্থানীয় সকল অধিবাসীর মধ্যে দেখা যায়;
>
> দ্বিতীয়তঃ আরবী ভাষায় যখন 'কাফ' এবং 'খে', 'জীম' এবং 'যে' দুই ধ্বনিই সমভাবে আছে, তখন কেবল এই 'খে' এবং 'যে' উচ্চারণের জন্য আরবী প্রভাব স্বীকার করা যায় না।..বহুস্থানে যে শ ষ স স্থানে হ কার উচ্চারণ হয়, তাহা অবশ্য পারসী প্রভাবের ফল নয়।[১৭]

'আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের' ভূমিকায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলাদেশের বিভিন্ন উপভাষায় রক্ষিত ভাষার কিছু প্রাচীন লক্ষণের উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন বাংলার একবচনের 'মই' সর্বনামটির রূপান্তর 'মুই' আধুনিক শিষ্ট বাংলায় অসাধু বলে পরিত্যক্ত; কিন্তু কোন কোন উপভাষায় তা রক্ষিত, যেমন পূর্ব সিলেটীতে 'মুই মারো', দিনাজপুরে 'মুইমারঁ', 'হামরা মারি'। সাধু বাংলা ভিন্ন উপমহাদেশের সমস্ত আর্য ভাষায় নিষেধাত্মক অব্যয় ক্রিয়ার পূর্বে বসে, এই বৈশিষ্ট্য প্রাচীন ও আদি মধ্য বাংলাতেও রক্ষিত, চট্টগ্রামের উপভাষায় এই বৈশিষ্ট্য রক্ষিত। বাংলাদেশের বিভিন্ন উপভাষার আরো যে বৈশিষ্ট্যের কথা মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন তা হলো আসামী ভাষার সঙ্গে তার সাদৃশ্য। যেমন—সর্বনামের প্রথম পুরুষের স্ত্রীলিঙ্গ সিলেটীতে 'তাই', চট্টগ্রামীতে 'তেই', 'তাই', 'হিতি', ঢাকায় 'হাতাই', নোয়াখালীতে 'হেতি'। আসামী ভাষায় 'তাই' রূপ আছে। আসামী ভাষা ও চট্টগ্রামী উপভাষার ধ্বনি ও রূপতত্ত্বে ঐক্যের উদাহরণ, ধ্বনিতত্ত্বে ঘোষ মহাপ্রাণ 'ঘ' 'ধ' 'ভ' এবং আদি অবস্থানে 'হ' ধ্বনির উপস্থিতি। রূপতত্ত্বে—সম্বন্ধের একবচনে 'র্', যেমন হাতর্, ঘরর্। অধিকরণের একবচনে 'ত্' বিভক্তি যথা, বারিত্, ঘরত্। সর্বনামের প্রথম পুরুষের স্ত্রীলিঙ্গে আসামীতে 'তাই', চট্টগ্রামীতে 'তাই', 'তেই', 'হিতি'। পদক্রমে নিষেধার্থক অব্যয় 'ন'এর ক্রিয়ার পূর্বে ব্যবহার, যথা ন গেল, ন আছিল্ ইত্যাদি। এই সাদৃশ্য সম্পর্কে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ লিখেছেন,

> এই সাদৃশ্যের কারণ কি? উত্তর বঙ্গের ভাষার সহিতও আসামী ভাষার সাদৃশ্য আছে, যেমন ধ্বনিতত্ত্বে ঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণ ও আদি হ কার রক্ষিত এবং রূপতত্ত্বে কর্মকারকে 'ক্', অধিকরণে 'ত্' বিভক্তি এবং সকর্মক ক্রিয়ার অতীত কালের প্রথম পুরুষে 'লে' যথা দিলে। পদক্রমে উত্তর বঙ্গের কোনও কোনও উপভাষায় ক্রিয়ার পূর্বে 'ন' বসে। হইতে পারে প্রাচীন বাংলা ভাষার একটি স্রোত উত্তরবঙ্গ হইতে পূর্ব অভিমুখে আসামে প্রবেশ করে। পরে সেই স্রোত আসাম হইতে দক্ষিণ অভিমুখে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এককালে বাংলা-

---

১৬ ঐ

১৭ ঐ

দেশের এই পূর্ব প্রান্তের ভাষা বোধ হয় আসামীর সহিত একরূপ ছিল; কিন্তু পূর্ব বঙ্গের উপভাষার প্রভাবে তাহার বৈশিষ্ট্য লোপ হইয়া পূর্ববঙ্গের উপভাষা গোষ্ঠীর শামিল হইয়াছে। সিলহেটী উপভাষায় এবং ময়মনসিংহের পূর্বাঞ্চলে 'তাই' শব্দ তাহার প্রাচীনত্ব রক্ষা করিয়াছে।[১৮]

বাংলাদেশের উপভাষা নিয়ে আরো কাজ করেছেন,—গোপাল হালদার নোয়াখালী, পূর্ববঙ্গ এবং চট্টগ্রামের; ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক চট্টগ্রামের; কৃষ্ণপদ গোস্বামী ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম এবং উত্তরপূর্ব বাংলার, শম্ভুনাথ চৌধুরী রংপুর ও উত্তর বাংলার; সুধীর করণ দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার; শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী সিলেটীর, মুহম্মদ আবদুল হাই ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং সিলেটের; মুনীর চৌধুরী পূর্ববঙ্গের; অমলেশচন্দ্র সেন পূর্ববঙ্গীয়; অনিমেষ কান্তি পাল ঢাকার; জ্যাক এ ড্যাব্‌স পূর্ববাংলার, নারিহিকো উসিদা চট্টগ্রামের; নীলমাধব সেন বাংলাদেশের কয়েকটি উপভাষার এবং মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির সন্দ্বীপ উপভাষার। উল্লিখিত আলোচনাগুলির মধ্যে হুমায়ুন কবিরের সন্দ্বীপ উপভাষার সামাজিক-ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ছাড়া সবগুলিই বাংলাদেশে বাংলাভাষার আঞ্চলিক রূপ বৈচিত্র্যের বিশ্লেষণ, দৃষ্টিভঙ্গী সেখানে ভৌগোলিক ও ভাষাতাত্ত্বিক। হুমায়ুন কবীরের অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভে ভৌগোলিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আংশিকভাবে হলেও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগের প্রয়াস রয়েছে। বাংলাদেশের উপভাষা বিশ্লেষণ প্রধানতঃ ভৌগোলিক এবং প্রচলিত ব্যাকরণের পদ্ধতিতে করা হয়েছে। এ কথা বলা যায় না যে আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে বাংলাদেশের উপভাষাসমূহ সনাক্তকরণ বা বিভিন্ন উপভাষার পূর্ণাঙ্গ ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হয়েছে। আজ অবধি বাংলাদেশের একটি উপভাষা মানচিত্র প্রণীত হয়নি, ইতিমধ্যে বাইরের পৃথিবীতে উপভাষাতত্ত্ব আঞ্চলিক ও ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতি অতিক্রম করে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ও সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। বাংলা দেশেও ভাষার বৈচিত্র্য অনুসন্ধান কেবল মাত্র ভাষাতাত্ত্বিক ভূগোলের মধ্যে সীমিত না রেখে সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হওয়া উচিত। আর উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যাকরণ ও সাংগঠনিক ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতির পরিবর্তে জেনারেটিভ পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তথ্য নির্দেশ :

Sir George Abraham Grierson, *Linguistic Survey of India*, Vol. V, Part I, 1903

Gopal Haldar,
1. A Brief Phonetic Sketch of the Noakhali Dialect of South Eastern Bengali, Calcutta University Journal of Dept. of Letters, Vol. XIX, 1929
2. A Skeleton Grammar of the Noakhali Dialect of Bengal, *Ibid*, Vol. XXIII, 1933
3. The Chittagong Dialect of Bengali, *Ibid*, 1949

Amalesh Chandra Sen, East Bengali Speech Rythme, *Indian Linguistics*, Vol. 8, 1942-44

Krishnapada Goswami,
1. Lingustic Notes on Maimensing Dialect, *Indian Linguistics*, Vol. 7, 1939
2. Linguistic Notes of Chittagong Bengali, *Iibd*, Vol. 8, 1940-41

১৮ ঐ

3. Sibilants and Glottal Fricative 'h' in North East Bengal, Dialect, *Bulletione of the Philological Society of Calcutta*, Vol 2, 1961

Sambhu Chandra Chowdhury, Notes on Rangpur Dialect, *Indian Linguistics*, Vol. 7, 1939

Muhammad Abdul Hai, A Study of Dacca Dialect, *Studies in Pakistani Linguistics*, Lahore, 1964

2. A Study of Chittagong Dialect, *Ibid*, 1965

3. A Study of the Sylhet Dialect, *Shahidullah presentation Volume*, Lahore, 1966

Norihika Ucide, *Der Bengali Dialect Von Chittagong*, Wiesbaden 1970

Animesh Kanti Pal, 1. Phonemes of a Dacca Dialect of Eastern Bengali and the Importance of Tone, *Journal of the Asiatic Society*, Vol. 7, 1965

2. Phonology of a Dacca Dialect, *U. M. Comm Volume*, Allahabad, 1970

Nilmadhav Sen, Some Dialects of Bangladesh—An outline, *Indian Linguistics*, Vol 33, 1972

Muhammad Humayun Kabir, 3. *Descriptive Analysis of Sandirpi in its Socio-Culture Context*, Unpublished Ph. D. thesis, 1977. University of pona. India.